IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাদল সরকার বাংলা তাত্ত্বিক নাট্যকার ও উদ্ভট নাটক ভোমা

ধীরাজ সরকার

Key word :- থার্ড থিয়েটার, অস্তিত্বের থিয়েটার,পরীক্ষামূলক, অ্যাবসার্ড, অস্থিবাদী দর্শন, অস্তিত্বের অযৌক্তিক সম্পর্কের সচেতন।

মূলপ্রবন্ধ-

বাদল সরকার বাংলা নাট্য জগতের এক বিখ্যাত তাত্ত্বিক নাট্যকার, যিনি তাঁর নাটকের মাধ্যমে বাংলা নাট্য সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চকে এক নতুন খোলা দিশা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের বিচার-বিশ্লেষণে এবং পাশ্চাত্য বিভিন্ন ধারণার সংমিশ্রণে এক মুক্ত মঞ্চের আবির্ভাব ঘটালেন--যা বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর আগে কোনোদিনই কেউ করতে পারেননি। তিনি পুরোনোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে এলেন এক নতুন পথের দিশা। তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, কলেজে বিচিত্র ডিগ্রি অর্জন করলেও তাঁর জীবন ছিল এক ভিন্ন পথের পথিক। আধুনিক জীবনের এক পথের দিশাকে আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র হয়েও টাউনপ্ল্যানিং, রিজিওনাল প্ল্যানিং নিয়ে পড়াশোনা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জন করেও শুধু বাঙালির নাটককে এক নতুন তথ্য ও তত্ত্বের মায়াজালে আবৃত করে আমাদের সামনে অ্যাবসার্ড থিয়েটার হিসাবে উপহার দিলেন, যা বাংলা নাট্য জগতে নতুন দিশাকে সামনে নিয়ে এলো। তিনি বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে বিশ্ব-নাট্য সাহিত্যের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চ, পরিবেশনা ও নির্দেশনাকে একত্রিত করে বিভিন্ন তত্ত্বের সংমিশ্রণে নাটককে মুক্ত অঙ্গনে নিয়ে এসে দাঁড় করালেন। তাঁর নাটক তাঁর জীবনের কথা বলে। তিনি তাঁর জীবনের যতটা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণকারী ছিলেন, তাঁর নাটকগুলিও সেভাবেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি অভিনয়, পরিচালনা ও নাট্য-নির্মাণ প্রতিটি বিষয়ে এক বুদ্ধিদীপ্ত চমকের প্রকাশ রেখেছেন। জীবনের বিভিন্ন জটিলতা মানব জীবনকে কীভাবে অন্ধকারে পর্যবসিত করে এবং মানুষ কীভাবে ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মৃত্যুর পথকে উন্মুক্ত করে--তা থেকে মুক্তির এক সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ধারাকে আমাদের সামনে বাদল সরকার বিভিন্ন নাট্য রচনা ও নির্দেশনার মাধ্যমে

পরিবেশন করলেন, যা আমরা তাঁর নির্বাচিত অ্যাবসার্ড নাটকগুলিতে দেখতে পাই। পবিত্র সরকার তাই বলছেন -

"বাদল সরকার মহাশয়ের এই নাটকগুলির দিকে সেজন্য আমাদের নজর নতুন করে ফেরানো দরকার। এ নাটকগুলি সমাজ বদলের সহায়ক কি না, হলে কতটা এবং কীভাবে—এসব তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে বেশিরভাগ নাটকের দর্শক ভারাক্রান্ত নয়, ভারাক্রান্ত না হওয়াই সম্ভবত ভালো। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে হাস্যরসের, সহজ নির্মল যাকে ইংরেজিতে belly-laugh বলে তার যে একটা ইতিবাচক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ভূমিকা আছে--এ সম্বন্ধে ডাক্তার থেকে দার্শনিক—সকলেই একমত। অন্যদিকে বাঙালির সংস্কৃতিতে স্বচ্ছন্দ ও সুরচিত হাসির নাটক আঙুলে গোনা যায়, অনেক বাঙালি অতিরিক্ত গোমড়ামুখো, তার্কিক, তাত্ত্বিক এবং বেরসিক, সে সব কিছুতেই গভীর অর্থ খোঁজে এবং দেশের ও দশের উপকার না হলে শিল্পসৃষ্টিমাত্রেই নিষ্ফল--এমন ভাবতে চায়— এ অভিযোগও শোনা যায়।"[১]

বাদল সরকার তাঁর নতুন ব্র্যান্ড 'স্ট্রিট থিয়েটার'-এর জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কলকাতার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের পথিকৃৎ। তিনি একজন বিখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা এবং পরিচালক হিসেবে সুপরিচিত। মূলত বাংলায় রচিত তাঁর নাটকগুলির বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, কালিদাস সম্মান, জওহরলাল ফেলোশিপ এবং সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত হয়েছেন। বাদল সরকার, একজন মার্কসবাদী হলেও আধুনিক ভারতের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার এবং পরিচালক, যিনি থিয়েটারের রূপান্তরিত ধারণাকে বিপ্লবী করে তুলেছেন এবং থিয়েটারকে ড্রোনিং স্টাফ থেকে মুক্ত করেছেন। বাদল সরকার, আসল নাম ছিল সুধীন্দ্রনাথ সরকার, কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবপুরের স্বনামধন্য বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন। পরে ১৯৯২ সালে তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি নাটক করতে পছন্দ করতেন।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের পর থেকে তাঁর নাটকে ও নাট্য রচনাকে নাট্যজগতের সাথে পরিচিত করতে শুরু করে। তাঁর নাটকগুলিতে আমরা দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৯-'৫০ সাংবিধানের পরিবর্তন, কার্যকারিতা; ১৯৫০ সালে ভারতের জনগণনা, ভুটান বিদ্রোহ, সাধারণ নির্বাচন; ১৯৫৩-'৫৪ সালের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন; পঞ্চান্ন সালের পারমাণবিক বোমা প্রবর্তন; ১৯৫৮-'৫৯ সালের দক্ষিণ ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা, ১৯৬১- ৬৪ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য সমস্যা, ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিদেশনীতি, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা; ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ সালের ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক, যুদ্ধ, ১৯৭১ সালের নির্বাচন; ১৯৮৩ থেকে ১৯৯১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু, মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা, অন্তর্বর্তীকালীন অস্থিরতা; ১৯৯২-৯৭ সালে বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন সমস্যা--এই সকল ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলি তাঁর নাটকে সামগ্রিকভাবে বিধৃত হয় এবং মূল্যায়নের নথি হিসেবে কাজ করে।

বাদল সরকারের আবির্ভাব ষাটের দশকে হলেও তিনি কিন্তু পূর্বাবস্থা থেকেই অর্থাৎ ছাত্রাবস্থা থেকেই এই নাট্য অঙ্গনের প্রদীপ জ্বালানোর কাজটি শুরু করেছিলেন। 'অতিথি', 'লালপাঞ্জা', 'বন্ধু' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে অভিনেতা বাদল সরকার পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেন। নাটকগুলি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প থেকে অভিনীত। ১৯৫৬ সালে তিনি 'মাঙ্কি বিজনেস' নাটকের অনুসরণে 'সল্যুশন এক্স'-এর মাধ্যমে তাঁর নাটক রচনার সূচনা করেন। তাঁর রচিত প্রথম মৌলিক নাটক 'বড়োপিসীমা' তিনি লন্ডনে অবস্থানকালে লিখেছিলেন ১৯০৭ সালে। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি একটি চক্র গড়ে তোলেন। তাঁর নাট্যজীবনের সফল বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ১৯৬৭ সালের 'শতাব্দী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯৬৮ সালে ২৩ শে জানুয়ারি ফারাক্কায় তিনি প্রথম 'কবি-কাহিনী' নাটকটি শতাব্দী নাট্যদলের মাধ্যমে অভিনীত করান। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি যে সকল নাটক রচনা করেছিলেন সেগুলি প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা হয়েছিল। পরিচালক বারীণ সাহার পরিচালনায় ১৯৬৩ সালে তিনি 'তেরো নদীর পাড়ে' চলচ্চিত্রে দিব্যেন্দু চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন। ১৯৭০ সালের দশের গোড়া থেকে বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককে ভেঙে ফেলে মঞ্চ ছেড়ে নেমে আসেন রাস্তায়। তিনি তৈরি করেন তৃতীয় থিয়েটার।

তৃতীয় থিয়েটারের প্রাণ হচ্ছে, সমাজকে পরিবর্তিত করার তাগিদে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়--যদি না মানুষের পরিবর্তন ঘটে, মানুষের চিন্তা-চেতনার, জীবনধারার পরিবর্তন না ঘটানো যায়। তৃতীয় থিয়েটারের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলা যায় যে, বাদল সরকার ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত থার্ড থিয়েটারের আঙ্গিকে তাঁর নাটকগুলি লেখেন। 'শতাব্দী', 'পথসেনা', 'আয়না' ১৯৯৩ সালে লেখা। অ্যাকাডেমিতে 'সাগিনা মাহাতো' নাটকটির অভিনয় চলাকালীন তিনি রিচার্জ শেখ মিনারের সাথে পরিচয় লাভ করেন । পরবর্তীতে তিনি শেখ মিনারের লেখাগুলিকে বুঝতে শুরু করেন এবং থার্ড থিয়েটারের স্বরূপ বুঝে ফেলেন। নাট্যাঙ্গনের থার্ড থিয়েটারের প্রকাশ তিনি পূর্ণভাবে করতে শুরু করেন যাকে তিনি 'ফ্রি থিয়েটার'ও বলেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী এক নাটক প্রতিষ্ঠাতা। আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা, শ্রদ্ধাহীনতা, মানুষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিক্ষুব্ধতা, রাজনৈতিক চিন্তার নতুন মূল্যায়ন, শ্রেণি সংগ্রাম এই সকল বিষয়কে তিনি অবলম্বন করে নাটকগুলিকে মুক্ত করেন। তিনি পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার; টাউন প্ল্যানার, কোলাজ তৈরিতে পারদর্শী হলেও নাটকগুলিকে মানুষের মুক্ত জীবনে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি তিনি অনায়াসে করে ফেলেছিলেন।

বাদল সরকার তার নাট্য থিয়েটারের বিষয়বস্তুর প্রণয়নে পরীক্ষামূলকভাবে আন্তনিন আর্টআউট(Antonin Artaud, French writer) পিটার গ্রুপের জুলিয়ান বেকের(Julian Beck, American actor) মত শিল্পীদের কাছ থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি দস্তেভস্কি(Fyodor Dostoyevsky), স্প্যানিশ লাভসকি(Lovosky), বার্টল্ট ব্রেখট (Bertolt Brecht, German), অগাস্টা বল (Augusta boll) ইত্যাদি শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'অ্যাপ ও অস্তিত্বের থিয়েটার' এই থিমেটিক বিষয়বস্তুর প্রণয়নে উপরোক্ত নাট্যকারদের প্রভাব তাঁর নাটকে লক্ষ করা যায়। তাঁর এই থিয়েটারের ফরমেট আত্তীকরণর অভ্যাস তাঁর বিকাশে সহায়তা করেছিলেন।

তাঁর আত্মজীবনী 'পুরোনো কাসুন্দি' (প্রথম খন্ড, ২০০৬) থেকে জানতে পারি যে,

"বাদল সরকার (জন্মগতভাবে সুধীন্দ্র সরকার, বৃষ্টির দিনের জন্মেছিলেন বলে ডাক্তার কাকার দেওয়া ডাক নামটাই টিকে গেলো) ছেলেবেলা থেকে তাঁর নাটক পড়তে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। শুধু পড়াতেই শেষ নয়, বাড়ির তেতলায় একলার জন্য একটি ঘর পেয়ে যাওয়ায়, তাঁর জবানিতে "রবিবার দুপুরে-টুপুরে কোন একটা বাঙলা নাটক নিয়ে একাই সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতাম খাটে বসে বসেই।" এটা চলছিল তাঁর ক্লাস সিক্স-সেভেন থেকে। দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ আর গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি ছিল তাঁর সঙ্গী, আর তাঁর "সবচেয়ে প্রিয় ছিল কমিক চরিত্রগুলো।" এই হল তাঁর নাটক ভালোবাসার "প্রথম বীজ"। সেই সঙ্গে "দ্বিতীয় বীজ" ছিল রেডিয়ো নাটক। তখনকার ক্রিস্টাল রেডিয়োতে কানে হেডফোন লাগিয়ে শুক্রবার তিনঘন্টা ধরে নাটক শুনতেন তিনি আর তাঁর মেজদি, পরে ভালভ্ রেডিয়ো আসাতে হেডফোনে কান টনটন করার সমস্যা ঘুচেছিল। হলে গিয়ে থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা বাল্যে-কৈশোরে তত হয়নি, রেডিয়োর কল্যাণে অবশ্য "তখনকার রথীমহারথীদের অভিনয় কণ্ঠস্বর সব পরিচিত ছিল।" এঁদের মধ্যে প্রধানত ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ি, ভূমেন রায়, রবি রায় ইত্যাদি। তুলনায় শিশিরকুমার তত নয়। সাজাহানে জাহানারার অভিনয় আলাদা করে মনে দাগ কেটেছিল, কিন্ত অভিনেত্রীর নাম স্মরণে আসেনি। বিশেষ কোনো অভিনেত্রীর কথা আলাদাভাবে মনেও রাখেননি।"[২]

তিনি উনিশ শতকের শেষের দিকে বেশ কয়েকটি পশ্চিমা থিয়েটার আন্দোলনের প্রভাবে নাটক রচনা ও নির্মাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অজানা কিছু অভিযান ও কিছু পথনাটক পরীক্ষামূলক পরিচালকরা করে নতুন সম্ভাবনার উন্মোচন ঘটিয়ে থিয়েটারে এক নবজন্ম দিলেন। অভিনেতাদের কাজ ও থিয়েটারের প্রকৃত সম্ভাবনার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। মেয়ার হোড রেনহার্ড পরিচালকের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। আলোর ব্যবহারকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার মতে থিয়েটারের শিক্ষাগত প্রকৃতি হল থিয়েটারের অন্বেষণের এক উদ্বিগ্ন চিত্র। তারা আরো মনে করে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করা উচিত নয়। যা অনুকরণীয় এবং শব্দের নাগালের বাইরে। আধুনিক আমেরিকান নাট্যকারেরা মনে করেন অমৌলিক থিয়েটার হলো বিমূর্ত ধারণাকে সংশ্লেষিত করে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা। তবে কিছু কিছু আমেরিকান নাট্যকার যেমন পিটার গ্রুপ ইউজেনিক অভিনেতার ও দর্শকের লাইভ সম্পর্ককে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নাটকের পদ্ধতি ও পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণী নতুন নাটকের নবদ্বীপকে উন্মোচিত করেছে। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে থিয়েটারে সামাজিক ধর্মীয় আদর্শ ছিল পুরোপুরি তবে তা পরবর্তীতে কনস্ট্যান্টিন স্তানি স্লাভস্কির (Konstantin Stanislavski)(১৮৬৩-১৯৩৮) মতে ব্যক্তিত্বের বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠে। তবে বিশ শতকে তা বিভিন্ন ধরনের কৌশলী নাটকের মূল রূপকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই নাটকের সিস্টেম তৈরি এবং জাতীয়তার চাহিদাকে অনুসরণ করে এক নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করার চেষ্টা করেন। এইসব নাট্যকারেরা এভাবে পাশ্চাত্যের নাটকের একটা সৃষ্টি হতে শুরু করে অভিনেতার অনুভূতি, অভ্যন্তরীণ

সত্য, চরিত্রের অভিজ্ঞতা, মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তারা অনুসরণ করতে শুরু করলেন। তিনি পাশ্চাত্য থিয়েটারের 'স্টানলিস্কি পদ্ধতি'র আভ্যন্তরীণ ও বাইরের পথ অনুসরণ করেছিলেন। এই পথ অনুসারে অভিনেতাকে অবশ্যই আভ্যন্তরীণ অনুভূতির সত্য দিয়ে শুরু করতে হবে। তাই চরিত্র, অভিজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অভিনেতা সৃজনশীল অবস্থায় পৌঁছাতে পারে তখনই, যখন তার পুরো মনস্তাত্ত্বিক দৃশ্যমান ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্ত কিছুর মধ্যে সে জড়িত থাকবে। ঘনত্ব, পরিস্থিতি, কল্পনা, মনোযোগ, সত্য, বিশ্বাস, যোগাযোগ, অভিযোজন, টেম্পো, রিদম, আবেগ ও ম্যানার এই সকল উপাদানই শারীরিক ক্রিয়া-কলাপের আভ্যন্তরীণ ন্যায্যতাকে তৈরি করতে সাহায্য করবে বলে তিনি মনে করেন।

বাদল সরকারের নাটকগুলোকে অনুদিত অর্থাৎ রূপান্তরিত নাটক হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করে পাই[৩]-

'সলিউশন এক্স' নাটকটি বিদেশি চলচ্চিত্র মাঙ্কি বিজনেস এর অবলম্বনে রচিত করেন,

'স্পার্টাকাস' নাটকটি হাওয়ার্ড ফাস্ট এর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত,

'হট্টমালার ওপারে' নাটকটি লীলা মজুমদার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প অবলম্বনে রচিত,

'সগিনা মাহাতো' নাটকটি গৌর কিশোর ঘোষের গল্প অবলম্বনে রচিত,

'বাঘ' নাটকটি The Tiger/Murray Schisgal অনুবাদে রচিত,

'একটি হত্যার নাট্যকথা' নাটকটি পিটার হাইস এর 'ম্যারাসাট' নাটকের অনুবাদে রচিত,

'নদীতে' নাটকটি অ্যাডওয়ার্ড বন্ডের নাটক অবলম্বনে রচিত,

'সাদাকালো' নাটকটি Mitwa, Ngema Siman এর নাটকের অবলম্বনে রচিত,

'চড়ুইভাতি' নাটকটি ফেরনেন্দো আরাবেলের 'পিকনিক অফ দ্য ব্যাটেল ফিল্ড' অবলম্বনে রচিত।

তাঁর মৌলিক নাটকগুলো হলো[৪] -

শনিবার (১৯৫৯), বড়ো পিসিমা (১৯৫৯), বল্লভপুরের রূপকথা (১৯৬৩), সারারাত্রির (১৯৬৩), কবিকাহিনী (১৯৬৮), বিচিত্রানুষ্ঠান (১৯৬৮), এবং ইন্দ্রজিৎ (১৯৬৫), বাকি ইতিহাস (১৯৬৫),যদি আর একবার (১৯৬৬), পরে কোনোদিন (১৯৬৬), প্রলাপ (১৯৬৬), ত্রিংশ শতাব্দী (১৯৬৬), পাগলা ঘোড়া (১৯৬৭), শেষ নেই (১৯৭০),ভুলরাস্তা (১৯৯২), গণ্ডী (১৯৭৮), বাসি খবর (১৯৭৯), উদ্যোগপর্ব (১৯৮২), খাট-মাট-ক্রিং (১৯৮৩), সিঁড়ি (১৯৮৬), চূর্ণ পৃথিবী (১৯৮৭), লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী (১৯৭৪), মিছিল (১৯৮৪),

ভানুমতি কা খেল (১৯৭৪), নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র (১৯৭৪), রূপকথার কেলেঙ্কারী (১৯৭৫), ভোমা (১৯৭৬), সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস (১৯৭৬) ইত্যাদি।

বাদল সরকারের জ্ঞান-গরিমায় বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তিনি শৈল্পিক নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। আসলে অ্যাবর্সাড তত্ত্বটি এমন বিষয় যা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য ভাবনা। পরিবেশ পরিস্থিতি কখনো কখনো মানুষকে ভিন্ন করে দেয়। মানুষ ভিন্ন আলাদা হয়ে যায় অন্যদের থেকে। সে নিজের নির্মিত রাজ্যে মৃত্যু ও অপার্থিব জগতের আবেশকে লাগাতে থাকে। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় অস্তিবাদী দর্শন। তা নিজের অজান্তেই মানব মনে বাসা বেঁধে যায়। আর সৃষ্টি হয় অস্তিবাদী দর্শনের খেলা। এভাবেই ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের রহস্যময়ী মায়াজাল। এভাবে মানুষ সমাজ থেকে তথা নিজের চৈতন্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। সে বিশৃঙ্খল ঘটনাকে একসূত্র বাধার চেষ্টা করে। এটি স্টিম অফ কনশাসনেস মগ্ন চৈতন্য প্রবাহ।

অ্যাবসার্ড অস্থিবাদী দর্শনর একটি পরিনীত রূপ। মানব জীবনের মানসিক নিয়ন্ত্রণ রেখাকে খোয়ানোর এক পরম আকর্ষণ। যেখানে কোন রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। রয়েছে অস্থিত্বের বাসনা ও অন্তহীন প্রেরণা। এই অ্যাবসার্ড নাটকগুলোই এভাবে nathing happened, nobody come, nobody goes, it's a fool হিসেবে প্রতীয়মান হয়। যা মানব অস্থিত্বে অ্যাবসার্ড তত্ত্বকে প্রতিস্থাপিত করে। তত্ত্বের মোড়কে মিশ্রিত এই পোস্ট মর্ডান ভাবনাটি বর্তমান বিভিন্ন সাহিত্যকে বিচলিত করে তুলেছে। এই ভাবনায় লক্ষহীন অবান্তর অস্তিত্বের ভাবনায় মানুষ ঘুরে বেড়ায়। জীবনের ঐতিহ্যের মূল্যবোধ এখানে ধরা পড়ে এবং এই মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। এটাকে এক সূত্রে গাথা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই জীবন এক দুর্দম শূন্যতায় ভরে যায়। এই চরম দুর্দম শূন্যতা মৃত্যুচেতনাকে জাগ্রত করে। যা পরবর্তী জীবনের সাথী হয়ে দাঁড়ায়। আপাতত অর্থহীন অযৌক্তিক বিষয়গুলিকে এখানে জীবনের পরিচালনায় পটে স্থান দিতে হয়। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় জীবন হতে থাকে অর্থহীন, লক্ষহীন। শূন্যতা থেকে শূন্যতার দিকে যাত্রা করে জীবন। কামু মনে করেন নির্যাসমুখী আইডেন্টিটির এক কপি। যুক্তি প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় অর্থ কাঠামো আর তাই অ্যাবসার্ডের উদ্ভব ভাবনা।

অ্যাবসার্ড শব্দটির অর্থ সামঞ্জস্যবিহীন। এর আভিধানিক অর্থ হিসেবে বলা যায়, যুক্তি বা সংগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন, বেমানান, অসঙ্গত, অযৌক্তিক কিছু। সাধারণভাবে অ্যাবসার্ড শব্দটি বলতে উদ্ভট হাস্যকর শব্দ দুটোই বোঝায়। অনেকে মনে করেন, অ্যাবসার্ড নাটক মানুষের পরিস্থিতিকে এক অস্বাভাবিক বিকৃত রূপে প্রতিফলিত করে। আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনতার অনুভূতির একটা আধ্যাত্মিক যন্ত্রণার জন্ম দেয়। অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের বর্তমান যুগে একটা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাট্যকারেরা অ্যাবসার্ড নাটকে নাট্য শিল্প সম্পর্কিত পূর্ব নিয়ম শৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করে এক নতুন পথের সন্ধান করেন। যা একেবারে অমুলক। তবুও তারা অ্যাবসার্ড নাটক রচনার মাধ্যমে তাদের নাটকদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। তারা সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল।

অ্যাবসার্ড নাটক প্রচলিত নাট্যধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলেই এই নাটকে সুষমামন্ডিত সূচনা, সমাপ্তি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনী নেই। নেই কোন চরিত্র বিশিষ্ট চরিত্র, নেই কোন বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ বরং আছে কতগুলি অর্থহীন আলোচনা। অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা যেতে পারে,

১) এ দর্শন অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের দর্শন। তবে অ্যাবসার্ডিজমের দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে একজিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্থিবাদকে অনেকে নির্দেশ করে থাকেন।

২) নাট্যকারেরা এমন এক নতুন সত্যের সন্ধান করেন যা কিন্তু সত্য-উদ্ভট-কাল্পনিক এই প্রবাহের পাঠক সমাজকে বিভ্রান্ত করে।

৩) জীবন বিবর্ণ, গতানুগতিক, অর্থহীন, নিষ্প্রাণ, দুর্বোধ্য, জটিল, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, নিরানন্দময়, সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ এই সমস্ত হতাশ জীবনের ছবি বারবার নাট্যকারেরা করেছেন তুলে ধরেছেন অ্যাবসার্ড নাটকে।

৪) অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো মানুষ কিন্তু তারা সার্বিক বিচ্ছিন্নতাবোধে মগ্ন, নির্জন, একাকীত্ববোধে মগ্ন। এদের নির্বাচিত আউটসাইডার বলা যেতে পারে।

৫) বিশ্বে বস্তুগত প্রাচুর্য বর্তমানে প্রচুর কিন্তু তাতে মানুষ নেই অর্থাৎ মানুষের প্রাণ নেই। অ্যাবসার্ড নাটকের জগৎ আনরিয়ালিটির জগৎ। বিরাট শূন্যতা গ্রাস করে রয়েছে এই জগৎকে। এই শূন্য থেকে বলা হয় মেটাফিজিক্যাল এমটিনেস।

৬) অ্যাবসার্ড নাটকে পৃথিবীর এক ভয়াবহ, ভয়ংকর, গ্লানিময়, যন্ত্রণাদগ্ধ, বিচ্ছিন্নতার চিত্রকল্প অঙ্কন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭) এক অন্ধ শক্তি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে এখানে। মানুষের কাছে বেঁচে থাকাটা ক্লান্ত জীবনকে বয়ে নিয়ে চলার সমান।

৮) সেখানে কাল এলোমেলো হয়ে যায়। কালকে এখানে নির্দিষ্টসীমায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

৯) সব চরিত্র একই রকম আচরণ করে তাদের পার্থক্য করা সম্ভব হয় না কখনো কখনো।

১০) তবে এখানে মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য।

১১) সবকিছু মিলিয়ে অ্যাবসার্ড নাট্যকারেরা উদ্ভট, হেঁয়ালি ভরা ভাষাসংকেতের মধ্য দিয়ে কৌতুককে ফুটিয়ে তোলারও চেষ্টা করেন। তবে এই উদ্বোধন সাইকোলজিক্যাল নয় মেটাফিজিক্যাল।

১২) অ্যাবসার্ড নাটকে সুষম সূচনা ও সমাপ্তিসহ সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনি, বিশিষ্ট কোনো চরিত্র, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এসব কিছুই লক্ষ্য করা যায় না

১৩) অ্যাবসার্ড নাটকে মানুষের জীবনের বাঁকাচোরা বিকৃত অবস্থার প্রতিবিম্বন ঘটে। অ্যাবসার্ড নাট্যকারেরা অবিশ্বাস্য সম্ভব এই অবস্থা থেকে নাটকে প্রায় অবিশ্বাস্য অসম্ভব অর্থাৎ ইমপ্রবিবল ইম্পসিবিলিটি জাতীয় নাটকে আস্থা জ্ঞাপন করে। ফলে এই জাতীয় নাটকে উদ্ভতত্ত্ব প্রধান স্থান দখল করে নিয়েছে।

১৪) জন রাসেল টেলর 'The penguin Dictionary of Theatre' গ্রন্থে একই রকমের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের সমস্ত কাজে উদ্দেশ্যহীনতার অনুভূতি একটা আধ্যাত্মিক যন্ত্রণার জন্ম দেয়। এই আধ্যাত্মিক যন্ত্রণাই অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের প্রধান বিষয়বস্তু।

১৫) অ্যাবসার্ড নাটকে দেখি নাট্যকাররা নাট্যশিল্প সম্পর্কিত পূর্ব নিয়ম–শৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করে যে নতুন পথের সন্ধান করেন সেটি মোটেও সুবিধার ছিল না। এর সত্ত্বেও তাঁরা মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছিলেন। স্যার মার্টিন এসলিন 'The Theatre of The Absurd' বইয়ে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। কিন্তু এই নাটকে আছে অর্থহীন বকবকানি।

১৬) মার্টিন এসলিনের মতানুসারে, স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন ইয়নেস্কো, আর্থার অ্যাডামভ ও জাঁ জেনেক হলেন অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান রচিয়তা। এঁদের নাটকের লক্ষণ দেখে অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে, যার দর্শন অবক্ষয় ও নৈরাশ্যের সমান।

বাদল সরকারের 'ভোমা' (১৯৭৬) একটি শক্তিশালী নাটক। যেখানে নাট্যকার ভারতীয় শহুরে এবং গ্রামীণ জীবনের মধ্যে বৈষম্য দেখিয়েছেন। 'ভোমা' নাটকটির বিষয় বিন্যাস বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের ভোমা নামক নিরীহ এবং নি:স্ব গ্রামবাসীকে নিয়ে। বাদল সরকার সুন্দরবনের দরিদ্র গ্রামবাসীদের ওপর সংঘটিত অমানবিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'ভোমা' নাটকটি শুধু ভোমা চরিত্রটির জীবন-মৃত্যুর গল্পই নয়, এটি একটি পারফরম্যান্স। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের নির্যাতিত কৃষকের জীবন-কাহিনি। নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের কথা নাট্যকার এখানে তুলে ধরেছেন।

'ভোমা' সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের নাটক। এটি রাঙাবেলিয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা যা সুন্দরবনের গ্রামীণ এলাকার ঐতিহাসিক শক্তির জরিপ করার নাটক। 'ভোমা' একটি অনন্য ধরনের নাটক। কোনো একটি সম্পূর্ণ চরিত্র এই গল্পে নেই, দৃশ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই, কিন্তু রয়েছে একটি বিক্ষিপ্ত উপস্থাপনা। প্রতিটি দৃশ্য পরিচালকের কল্পনা এবং অভিজ্ঞতায় পুরো শরীরের সাহায্যে অভিনয়ের মাধ্যমে একটি ধারনা উপস্থাপন করে।

প্রথম দৃশ্যে ভোমার অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"দুই। কে ভোমা

তিন চার পাঁচ ছয়। ভোমা কে?

এক। তোমাকে আমি দেখি নি। কিন্তু ভোমা আছে। আরো জানি- ভোমা না বাঁচলে, ভোমা না বাঁচালে আমি বাঁচি না। আমরা বাঁচি না কেউ বাঁচে না!

দুই তিন চার পাঁচ ছয়। ভোমা কে? [এক লাফিয়ে উঠে ঠেলে ওদের মধ্যে ঢুকলো]

এক। ভোমা একজন--- ভোমা একটা--- ভোমা হচ্ছে---

[কিন্তু ওদের চোখে নির্বিকারতা।'এক' হাল ছেড়ে বেরিয়ে এলো।]

পারছি না ভোমা। তোমাকে নিটোল চিমছাম প্রাঞ্জল একটা ফরমুলায় কিছুতেই ফেলতে পারছি না।

দুই। ভোমা নেই।

তিন চার পাঁচ ছয়। ভোমা নেই ভোমা নেই ভোমা নেই-

দুই। ভোমা নেই, আমি আছি।

তিন। না আমি-

চার। না তুমি না, আমি-

পাঁচ। এই না, আমি আমি-

ছয়। না না, আমি-

সবাই। আমি আমি আমি আমি-

এক। (ওদের কথার উপরে) আমি- আমি- আমি- আমি আর একটু আরাম। আমি- আমি- আমি- আমি- আর একটু সাচ্ছন্দ্য। আমি- আমি- আমি- আমি আর একটু বিলাস। ভোমা তুমি আমি এরা সবাই মিলে কবে 'আমরা' হবো বলতে পারো? ভোমা-আ-আ!"[৫]

ভোমা হলো নিপীড়িত কৃষকের জীবনের নাটক। এরা সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে একটি শোষিত শ্রেণি। বিষাক্ত বৃক্ষের বন এই নাটকে সুবিধাবাদী সমাজ ও শোষকের পরিপূর্ণ প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আর ভোমা হলো আদিম বর্বর জাতির প্রতীক। এখানে বিষাক্ত গাছগুলি চারপাশের বেড়ে ওঠার দল। এই নাটকে 'মরচে কুড়াল' নামে একটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রতীকটি হলো দীর্ঘদিন ধরে চালানো নির্যাতনের প্রতীক অস্ত্র--যা দিয়ে সহজে কাটবে না কিন্তু দীর্ঘদিন নিপীড়ন চালানো সম্ভব হবে। আবার মরচে কুড়াল দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয়নি। নাটকের দৃশ্যগুলিতে এভাবে নিপীড়িত দরিদ্র কৃষকদের জীবন অস্তিত্বের সংগ্রামের কথা বলেছেন নাট্যকার। এরা সারাদিনে একবার মাত্র ভাত খেয়ে পেট ভরান। স্যামসাং ব্ল্যাকবোর্ড কোম্পানির কর্মরত ব্যক্তিও এখানে শোষণের শিকার হন। এছাড়া ব্যাংকের লোন নেই, পাম্প নেই, সেচ নেই, চাষাবাদ নেই, খাদ্য নেই; তাই তারা অস্তিত্ব হারাচ্ছে ধীরে ধীরে। তা নিম্নের কথেপকথন এ দেখা যায়-

"তিন। কে ভোমা?

এক। একটা মানুষ। ভোমা ভাঙে না। ভোমা সৃষ্টি করে। ভোমাকে ভাঙ্গি আমরা।

তিন। কি বলছো বুঝতে পারছি না। কে ভোমা?

এক। ভোমা জঙ্গল। ভোমা আবাদ। ভোমা গ্রাম। ভারতবর্ষের বারো আনা লোক গ্রামে থাকে। কোটি কোটি ভোমা। ভোমাদের রক্ত খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি শহরে।

তিন। রক্ত খেয়ে?

এক। হ্যাঁ। ভোমারা যদি ভাত খেতো, তাহলে আমরা খেতে পেতাম না। ভোমার লাল রক্ত সাদা যুঁইফুল হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের ভাতের থালায়। রোজ দুবেলা"[৬]

'ভোমা' সমাজে প্রেমহীনতার প্রভাবকে চিত্রিত করেছে। বাদল সরকার দেখিয়েছেন প্রধান শিক্ষক তুষার কাঞ্জিলাল এর কাছে ভোমা সুন্দরবন জেলার কথা শুনেছে। যেখানে রাঙ্গাবেলিয়া গ্রামের স্কুল রয়েছে।এটি জাতীয় সামাজিকতামূলক নাটক। বিনোদনই নয় এখানে দর্শকদের সচেতন করে তোলার জন্য শহর এবং গ্রামের অবস্থানকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার কথা এখানে তুলে ধরেছেন তিনি। দারিদ্র্যতা, ক্ষুধা, অজ্ঞতা ও শোষণ পরিমাণে এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। শান্তি ও স্বাধীনতার বেড়াজালে সভ্যতার মানুষকে সচেতন করার জন্য তিনি এই নাটকটিকে আবির্ভূত করেছেন। বিকৃত, অমানবিক ও খন্ডিত সামাজিক চিত্র এখানে অঙ্কন করে তিনি লিঙ্গ, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মতবিভেদকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এটি নাট্যকার বাদল সরকারের একটি আধুনিক নাটকের তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। সাধারণ মানুষ সমস্যায় জর্জরিত। তিনি থিয়েটারকে হাতিয়ার করে মানুষের অস্তিত্বের অযৌক্তিক সম্পর্কের সচেতন দিককে তুলে ধরেছেন। তিনি সমস্ত পরিস্থিতি ও সমস্যাকে মোকাবেলা করার জন্য চরিত্রকে এখানে উপস্থাপিত করেছেন। তাই নাট্যকার বলেন-

পাঁচ। ভোমা খাবে বাবু। ভাত খাবে।

এক। (ক্লান্ত স্বরে) কি করে খাবে ভোমা? তুমি ভাত খেলে আমার পোলাও জোটে না। আজব এক ছবি বানিয়েছি ভোমা। এক টাকার ছবি, পাঁচ টাকার ছবি, দশ, বিশ, একশো টাকার ছবি- তাই দিয়ে তোমার রক্ত কিনে নিয়েছি ভোমা, তোমার মুখের ভাত- না না! আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এই মাটিটাকে ধরো প্রথমে, এই পৃথিবীটাকে-

দুই তিন চার ছয়। এই পৃথিবী।

এক। এই পৃথিবীটা তো সকলের, তাই না ভোমা? এই পৃথিবীটা কৃপণ হাত থেকে ভাত খুঁড়ে বার করতে তো তুমি কুড়ুল ধরেছিলে ভোমা, বাঘ মেরেছিলে, বাঘের থাবা খেয়েছিলে, তাই না ভোমা? এই পৃথিবীটা-

দুই তিন চার ছয়। এই পৃথিবী।

এক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পৃথিবীটার মালিক তো আমরা সবাই, তাই না ভোমা? আমরা সবাই যদি প্রাণপণে খেটে সব কিছু বানাতাম, বানিয়ে সবাই মিলে ভাগ করে নিতাম, তাহলে ওই আজব ছবিটা- যার জোরে ভোমা তোমার

রক্ত আমরা কিনে খাই, আর যার অভাবে তুমি ভাত পাওনা, ঐ আজব অশ্লীল ছবিটার পাট জন্মের মতো চুকিয়ে দিয়ে- আমি বোঝাতে পারছিনা ভোমা! শুধু বুঝতে পারছি- তুমি কুড়ুল হাতে উঠে না দাঁড়ালে এই বিষাক্ত গাছের জঙ্গল হাসিল হবে না ভোমা! আমার আবাদ, আমাদের আবাদ, আমাদের স্বপ্নের আবাদ।

['এক' একজনের কাছে ছুটে গিয়ে মুখ দেখবার চেষ্টা করছে, কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে।]

ভোমা! ভোমা! ভোমা!

দুই। কোথায় ভোমা? ভোমা সুন্দরবনে।

তিন। বুনো ভোমা, গায়ে বনের গন্ধ, বাঘের গন্ধ।

চার। তোমার মা সাপের বিষে নীল।

ছয়। ভোমার বাপ কুমিরের দাঁতে লাল।

দুই। ভোমার ভাই নুনের তেজে কালো"।[৭]

যাদের দেখা যায় না কিন্তু তাদের উপলব্ধি নাটকে পাওয়া যায়। তারা কথা বলে কিন্তু বাকিরা শুনতে পায় না। তাদের কথাগুলো অভিজ্ঞতা লব্ধ সমাজ সচেতনতামূলক। তারা প্রতিটি কথোপকথনের উত্তর দেয় কিন্তু কেউ তা শুনতে পায় না। দর্শক মনে করে যে তাদের উপস্থিতি এখানে বর্তমান।

নাটকের নামটি একটি শূন্যতার প্রতীক। এটি চরিত্রস্থান বা কোন জিনিস নয়। ভোমা পৃথিবী মাতার ও জলের দেবতা বিষ্ণুর পুত্র। ভোমা হল পুনর্ব্যবহার এবং রূপান্তর। নাটকে ভোমা শব্দের অর্থ ওঠানামা করতে দেখা যায়। সে মানবতার, মৃত্যুর প্রতীক, ঠান্ডা রক্তের প্রতীক। অযৌক্তিক ভাষা ও আলগা কাঠামো, মানুষের মনের ওঠা নামার সূচক হিসেবে ভোমা উপস্থিত হয়েছে। বাদল সরকারের ভোমা, নাটক ও চরিত্রের মাধ্যমে এক প্রতীকময়তার স্থান পেয়েছে। যা অ্যাবসার্ড তত্ত্বের প্রতিটি ধারণাকে সমর্থন করে। মানব জীবনে স্থাপিত হস্তান্তর, নিপীড়ন থেকে কারো রেহাই নেই। এই পরিবর্তন অনির্বচনীয়, পরিবর্তন নিপীড়নের পরিবর্তন। যেখানে অনিবার্যতা বাস্তবতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মানব জীবনের নৈরাশ্যকে স্থান দিয়েছেন। যা অস্তিবাদী দর্শনের সমর্থন করে। প্রান্তিকদের উপর ঊর্ধ্বতনদের শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতিত ভুক্তভোগীদের উপস্থাপন এইভাবে নাটকের প্লটকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন নাট্যকার।

ভোমাকে কেউ দেখেনি কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। এই ভোমা সার্বজনীনতার প্রতীক। সমস্ত শোষিত নিপীড়িত মানুষ যে শোষণ নিপীড়ন ও অবিচারের কারণে ভোগে—তাদের প্রতীক। নিজের সঙ্গীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য মরচে পড়া কুড়াল নিয়ে জঙ্গলে বিষাক্ত গাছ কাটে। তাই নিপীড়িত মানুষের মাঝে ভোমার ভূমিকা নিয়ে সমাজ ও দর্শক এখানে প্রশ্ন রাখে। নাট্যকার বাদল সরকারের মতে,-

"... কিন্তু ভোমার গল্প নাটকে নেই। চারিপাশে যা দেখে, যা শেখে, যা অনুভব করে ধাক্কা খাই, আঘাত পাই, রেগে যাই, তাই বেরিয়ে এসেছিল নাটকের চেহারার টুকরো টুকরো ছবিতে।"[৮]

'ভোমা' এমন একটি নাটক যেখানে ভোমার নামকরণ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ভোমার কথা অস্পষ্ট। ভোমা চরিত্রের বিচ্ছিন্নতা, পারম্পর্যহীন ঘটনা এবং বিচ্ছিন্ন কথোপকথন এই নাটকটিকে একটি উদ্ভট বা অ্যাবসার্ড তত্ত্বের প্রতিফলন হিসাবে পাঠকসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা নাটকের অঙ্গনে বাদল সরকার মহাশয় এরকম পারম্পর্যহীন বিশৃঙ্খল ভাবের মাধ্যমে এবং উদ্ভট, বিকৃত চরিত্রের উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের জীবনের শেষ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, বাদল সরকারের বিভিন্ন নাটকে যেভাবে উদ্ভট তত্ত্বকে স্থান দিয়েছেন তা অনবদ্য। 'ভোমা' নির্বাচিত নাটকে যেভাবে তিনি অ্যাবসার্ড তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন তা বাংলা নাট্য জগতে নতুন দিককে উন্মোচিত করেছে। তাঁর এই নাট্য বিশ্লেষণ উপস্থাপনা, নির্দেশনা এবং পরিচালনা সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে তিনি এই নাটকগুলির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন চরিত্র ও প্রতীককে মিলেমিশে একাকার করে দিয়েছেন। তিনি চরিত্রগুলোকে অ্যাবসার্ড তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রতীকি ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন। যা বাংলা নাট্য সাহিত্যে এর আগে কোনোদিন কোনো নাট্যকার করেননি। তাই তিনি নাট্য সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র স্থান দখল করে রয়েছেন। নাট্য সাহিত্যের একটি নতুন দিককে উন্মোচিত করবে বলে মনে করি।

গ্রন্থসূত্র:-

১) *নাটক সমগ্র (বাদল সরকার), ১ম খণ্ড,* ভূমিকা– পবিত্র সরকার , পৃষ্ঠা–৩

২) " *পুরোনো কাসুন্দি",* বাদল সরকার, পৃষ্ঠা ৪০

৩) Anjum Katyal, *Badal Sarcir: towards a theatre of conscience*, New Delhi, Sage publications india private limited, 2015, page 25

৪) 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাদল সরকারের নাট্যকর্ম'- উত্তরা চৌধুরী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭ পৃষ্ঠা ১৯।

৫) ভোমা,পৃ.৩১১

৬) ভোমা,পৃ.৩২১

৭) ভোমা,পৃ.৩২৯

৮) 'নাটক সমগ্র' (২য় খণ্ড), বাদল সরকার, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ভূমিকা, পৃষ্ঠা- ৬

গ্রন্থপঞ্জি

'অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষার বিভাষায়'- কুন্তল মিত্র, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫

'এবং ইন্দ্রজিৎ', বাদল সরকার , কথাশিল্প, কল-৭৩, মাঘ-১৩৭৫

'থার্ড থিয়েটারের জনক বাদল সরকার স্মরণে রিফট এর শোকসভা' ১৪ ই মে ২০১১, সংগ্রহ ১৪ ই মে২০১৭

'থিয়েটারের ভাষা'- বাদল সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৩

'দি অ্যাবসার্ড': নাটকে উদ্ভটতত্ত্ব- দত্তাত্রেয় দত্ত, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', নবেন্দু সেন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০৯

'নাটক সমগ্র' (২য় খণ্ড)- বাদল সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭

'নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার'– দর্শন চৌধুরী, একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৯

'নাট্যতত্ত্ব বিচার'- ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩

'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা'- সাধনকুমার ভট্টাচার্য; প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬৩

'পলিটিক্যাল থিয়েটার'- রথিন চক্রবর্তী(সম্পা.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, ২০০৩

'পুরনো কাসুন্দি' (১ম খণ্ড) বাদল সরকার, লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬

'পুরনো কাসুন্দি' (২য় খণ্ড) বাদল সরকার, লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬

'পুরনো কাসুন্দি' (৩য় খণ্ড) বাদল সরকার, লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬

'প্রবাসের হিজিবিজি'- বাদল সরকার, লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬,

'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ২০০৫

'*অস্তিবাদী জ্যা পল সাত্রের দর্শন ও সাহিত্য*', মৃণাল কান্তি ভদ্র, ১৯৮৮,

'*কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা*', বারীন্দ্র বসু, ১৯৭৮,

পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, নবেন্দু সেন, সাহিত্যলোক, কলকাতা,২০০৩

'সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা', নবেন্দু সেন, আবসার্ড নাটকে উদ্ভট তত্ত্ব, দত্তাত্রেয় দত্ত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৩